Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; UGC Recognized -UGC Journal No.: 47192. 1st July

Analysis of interactive-relationship between children and their elders

in the short stories of Ashapurna

আশাপূর্ণার নির্বাচিত ছোটগল্পে অভিভাবক- শিশুর পারস্পরিক সম্পর্ক

Sagarika Ghosh
Research scholar, University of Gour Banga, Malda, West Bengal, India

Abstract

The famous Bengali writer Ashapurna Devi in her writings not only presented the complexities of Bengali family life, society and women but also reveals the different shades of her child characters. Her short stories show how deeply she studied children. Generally, the term 'child' or 'childhood' is used in wider sense. The first eighteen years of life when a child remains completely dependent on his parent is considered as the childhood. Through the stages of infancy-childhood-adolescence a child moves towards the stage of maturity. Childhood is that stage when the children interact very closely to their parents as well as the other elders in their respective surroundings. The children are greatly influenced by their elder's attitude, behaviour and mentality. In this article, an attempt is made to analyse the interactive relationship between the children and their elders in the selected short stories of Ashapurna Devi.

Key words: Ashapurna Devi, childhood, children-elders interaction.

ভূমিকা

মানুষের মন প্রতিফলিত হয় আচরণের মধ্য দিয়ে। পরিণত ব্যক্তির মানসিকতা কেমন হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে তার শৈশব-যাপনের ওপর। সেই কারণে শৈশব মানবজীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। 'শৈশব' শব্দটিকে এখানে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। শিশুর জন্মের পর থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত কালপর্ব এর অন্তর্গত। এই কালপর্বকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়—শৈশব (পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত), বাল্য (বারো বছর বয়স পর্যন্ত) ও কৈশোর (আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত)।

পৃথিবীর সব জীবের মধ্যে মানবশিশুই সবচেয়ে দীর্ঘসময় পরনির্ভরশীল থাকে। এই পরনির্ভরশীল শৈশবের একটা বড় সময় কাটে অভিভাবকদের সান্নিধ্যে। তাই শিশুর মানসিকতা গঠনে অভিভাবকদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর কথাসাহিত্যে শিশুচরিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব

দিয়েছেন, ঘটনাবিন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের বিচিত্র কর্মকাণ্ড তথা মানসিকতা। আমাদের আলোচ্য, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে (নির্বাচিত) অভিভাবক-শিশুর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শিশুমনে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া।

উপাদান এবং গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে অভিভাবক-শিশুর পারস্পরিক সম্পর্কের নানা স্তর এবং শিশুর আচরণ ও মানসিকতায় তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার দিকটি আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছে মনস্তত্ত্বের জ্ঞান। মনস্তত্ত্বের ধারণাকে অবলম্বন করে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা এই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

পর্যালোচনা

বড়রা ছোটদের সবসময় সত্যি কথা বলার শিক্ষা দেন। অথচ বাস্তবে তা করতে গেলে অনেকসময় বড়রাই তার বিরোধিতা করেন। বড়দের এই দ্বিচারিতায় বিভ্রান্ত হয় শিশু। 'কী করে বুঝব' গল্পে দেখি, বাড়িতে বেড়াতে আসা আত্মীয়দের বুকুর মা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেও বুকু (ছয় বছর) অকপটে তাদের জানিয়ে দেয় যে, তারা অসময়ে আসায় তার বাবা-মাকে কতটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছে এবং তারা কতটা বিরক্ত হয়েছেন। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে বুকু আরো বলে যে, তারা চলে গেলে তাদের পেছনে নিন্দেও করা হবে। ছেলের কথাবার্তায় বুকুর বাবা-মা আত্মীয়দের সামনে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হন। স্বাভাবিকভাবেই আত্মীয়রা চলে গেলে বুকুর ভাগ্যে জোটে বেদম প্রহার। অবাক হয় বুকু, কী করবে বুঝে পায় না। কারণ বাবা-মাই তাকে সততার শিক্ষা দেন। আবার সত্যি কথা বললে তারাই শাস্তি দেন। বড়দের জটিলতা শিশুর বোধগম্য না হওয়ারই কথা। তবে উক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুকু যে পরবর্তী ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের উপদেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে দু'বার ভাববে, তা বলাই বাহুল্য। অভিভাবকরা অধিকাংশ সময়ই মৌখিক শাসন-উপদেশের দ্বারা শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই বিষয়টি তারা মাথায় রাখেন না যে, শিশু যতটা শুনে শেখে, তার চেয়েও বেশি শেখে দেখে। ফলে শিশুর সামনে কথাবার্তা ও আচরণে তারা সচেতন হন না। এর কুপ্রভাব পড়ে শিশুর ওপর। আলোচ্য গল্পে মা-বাবার কথা শুনে বুকু শিক্ষা পায় যে, আত্মীয়দের পেছনে তাদের নিন্দে-সমালোচনা করাই রেওয়াজ।

'সবদিক বজায় রেখে' গল্পে তনিমা-অলক দু'জনেই অফিসে চাকরি করায় সাড়ে চার বছরের মেয়ে বুতানকে রেখে যেতে হয় পরিচারিকা মালতীর তত্ত্বাবধানে। মালতীর হাতে মেয়ে এবং সংসার ফেলে যেতে বাধ্য হলেও তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না তনিমা। মালতীর ওপর নজরদারির দায়িত্ব বর্তায় শিশু বুতানের ওপর। মেয়ের মনে মালতীমাসির প্রতি বিরূপ ভাবনার বীজ পুঁতে দেয় তনিমা। ফলশ্রুতিতে বুতান মালতীর বিষনজরে পড়ে। মালতী বুতানের সামনেই তার মায়ের নামে নিন্দে করে। ইচ্ছে করে তাকে জানিয়ে দেয় যে, তাকে লুকিয়ে মা-বাবা থিয়েটার দেখতে গেছে। মালতীমাসির সান্নিধ্যে বুতান স্বস্তি পায় না। লোডশেডিং-এর সময় তার অসহযোগিতায় সংকট বোধ করে। আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মান খুইয়ে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মায়ের অনুপস্থিতিতে মালতীমাসি হয়ে ওঠে না তার স্নেহ-নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল। ফলে প্রবল মানসিক যন্ত্রণায় জেরবার হয় বুতান। বর্তমান স্বনির্ভরতার যুগে পুরুষের পাশাপাশি নারীও সমানভাবে কর্মক্ষেত্রে পা রেখেছে। ফলে অধিকাংশ শিশুকেই থাকতে হয় পরিচারিকার হেফাজতে। সেক্ষেত্রে অভিভাবক-পরিচারিকার পারস্পরিক বোঝাপড়া শিশুর বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। পরিচারিকাই হয়ে ওঠে শিশুর মাতৃস্থানীয়া। কিন্তু

আলোচ্য গল্পে সব দিক বজায় রাখতে গিয়ে তনিমা আসল দিকটিই নষ্ট করে ফেলে। জোগান দিতে পারে না মেয়ের মানসিক বিকাশের উপযোগী সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ। কেবল কাজের মেয়ের ওপর নজরদারি নয়, তনিমা নিজের শখপূরণের কাজেও মেয়েকে ব্যবহার করে। গাড়ি কেনার শখ মেটাতে সে বুতানকে দিয়েই অলকের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চায়। পরিস্থিতির টানাপোড়েনে ছোট্ট বুতান এগিয়ে যায় অকালপক্কতার দিকে।

'ভিতর পৃষ্ঠা' গল্পে দেখি, অনুর অনেকদিনের ইচ্ছে যে, সে স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় পুজোর বাজার করতে যাবে। টানাটানির সংসারে নানা কারণে তা হয়ে ওঠে না। অবশেষে এক রবিবার সে সুযোগ আসে। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে মেয়ের মন রাখতে অনু তার হাতে একটি সিকি দিলে সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাত বছরের খুকু বলে ওঠে, "হয়েছে আর আদর করতে হবে না। আমাদের ফেলে রেখে নিজে সেজেগুজে বরের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে"[১]। এতটুকু মেয়ের মুখে এই ধরনের উক্তি আমাদের অবাক করে। অনুসন্ধানে উঠে আসে কতগুলি দিক। অনু যে স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় বাজার করতে যাবে, তা শাশুড়ি-পিসিশাশুড়ির পছন্দ নয়। সহজেই অনুমান করা যায়, অনুর পেছনে সমালোচনার ঝড় ওঠে। হয়তো আক্রোশবশে তারা খুকুকেও মায়ের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে থাকবেন। ফলস্বরূপ অপরিণামদর্শী খুকু ঠাকুমা-পিসিঠাকুমার বাগ্‌ভঙ্গি অনুকরণে উক্ত মন্তব্য করে বসে। তবে তার রাগের পেছনে শিশুমনের একটি বিশেষ চাহিদা লুকিয়ে রয়েছে। শিশু সবসময় গুরুত্ব পেতে চায়, বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে থাকতে চায়। এতেই তাদের ভালোলাগা, এতেই তাদের আনন্দ। সেই চাহিদা পূরণ না হওয়ায় খুকু মায়ের প্রতি বিরক্ত হয়। সামান্য সিকি তার মন ভোলাতে পারে না। তাই সে সেটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

'আতঙ্কিত' গল্পে টোকন (সাত বছর) ভয় পায় প্রতি পদক্ষেপে—"ওর কেটে গেলে ওষুধ লাগাতে ভয়, সাবান মাখতে চোখে সাবান লাগার ভয়, ওষুধ খেতে তেতো লাগার ভয়, মাছ খেতে গলায় কাঁটা লাগার ভয়, এমনি যে কত তার লিস্ট দিতে বসলে রাত কেটে যাবে। আর সর্বোপরি হচ্ছে ভূতের ভয়।"[২] সাধারণত বড়দের মুখে গল্প শুনে কল্পনাপ্রবণ শিশুমনে অলৌকিক জগতের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। টোকনও তার পিসিঠাকুমার মুখে দৈত্য-দানব, ভূত-প্রেতের গল্প শুনেছে। তাই অন্ধকারে সে ভূতের ভয় পায়। সেই ভয় কাটাতে জোরে জোরে আওড়ায় 'ভূতের রক্ষামন্ত্র'[৩]—'ভূত আমার পুত, শাকচুন্নি আমার ঝি, রামলক্ষ্মণ বুকে আছেন, ভয়টা আমার কী!'[৪] টোকনের এই গেঁয়ো স্বভাব তার বাবা-মা, মি. ও মিসেস সোমের উচ্চবর্গীয় স্ট্যাটাসের পরিপন্থী। ছেলের এই স্বভাব দূর করতে তারা কঠোর হন। শাসন-তিরস্কারের পাশাপাশি তাকে বেশি করে অন্ধকার স্থানে আটকে রাখেন। এতে টোকনের ভয় তো যায়ই না, উল্টে সে বাবা-মায়ের প্রতি বিরক্ত হয়, মুখে মুখে তর্ক করে।

ভয় শিশুমনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। অস্বস্তি থেকেই ভয়ের উদ্ভব। এই ভয় দূর করতে তাদের প্রতি বাড়িয়ে দিতে হবে সাহায্যের হাত। ধৈর্যসহকারে ভয়ের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে তাদের বোঝাতে হবে। সেক্ষেত্রে শিশুর পক্ষে অনেক সহজ হবে ভয় কাটিয়ে ওঠা। তা না করে, শাসন-তিরস্কারের পথ অবলম্বন করলে মা-বাবার প্রতি শিশুর মনে কেবল আক্রোশই জমে ওঠে। বাবা-মাকে পাশে না পেয়ে মনের আক্রোশ থেকে টোকনও বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

স্কুল থেকে ফিরে দুই ভাই-বোন টিঙ্কু-রিঙ্কু ঘোষণা করে যে, এবার পুজোয় তারা নতুন জামা-জুতো নেবে না। শিক্ষকের পরামর্শে তারা সেই টাকা পাঠাতে চায় বন্যাপীড়িত মানুষদের সাহায্যার্থে। একাজে তারা বাবা-মায়ের সমর্থন পায় না। বরং তাদের নিরুৎসাহ করা হয় এই বলে, "ওই নিয়ে দেশের নেতারা ভাবছেন, মিশন টিশন থেকেও হচ্ছে। তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের অতসব ভাবার দরকার নেই। পুজোর সময় সাজবে গুজবে বেড়াবে ব্যস!"[৫] মা যথারীতি রিঙ্কু-টিঙ্কুর জন্য জামা-কাপড় কিনে আনেন। ছোটভাই টিঙ্কু দিদিকে বলে যে, মা নতুন জামা-জুতো কিনলেও তারা পরবে না। কিন্তু রিঙ্কু জানে, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। বাবা-মায়ের মন রাখতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগুলি তাদের পরতে হবে। শিশুমন নরম মাটির তালের মতো। তাকে যেমনভাবে গড়া হবে, সে তেমনই আকৃতি পাবে। স্কুলের শিক্ষায় রিঙ্কু-টিঙ্কু অসহায় মানুষদের কথা ভাবতে শেখে, তাদের পাশে

দাঁড়াতে চায়। কিন্তু বাবা-মায়ের শাসনে অবদমিত হয় তাদের সদ্‌গুণ। এইরকম পারিবারিক পরিবেশে কতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে তাদের উদার মনোভাব? স্কুলের শিক্ষাকে ধরে থাকলে বাবা-মায়ের প্রতি তাদের বিদ্বেষ বাড়বে। আর বাবা-মায়ের দ্বারা প্রভাবিত হলে আত্মকেন্দ্রিকতার চর্চায় তারা হারিয়ে ফেলবে তাদের সদ্‌গুণ, হয়ে উঠবে স্বার্থপর। শুধু রিঙ্কু-টিঙ্কু নয়, এসমস্যা আজকের অধিকাংশ শিশুরই। এযুগে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় মানবিকতা-পারস্পরিক সহযোগিতার পুরোনো ঐতিহ্য বজায় থাকলেও পারিবারিক শিক্ষা ভীষণভাবে ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, যার প্রভাব এড়ানো শিশুর পক্ষে অসম্ভব। 'এযুগের শিক্ষা দীক্ষা' গল্পে লেখিকা একালের শিশুর সংকীর্ণ মনোভাবের পেছনে তাই বিশেষভাবে দায়ী করেছেন এযুগের পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষাকে—"আগেকার মা বাপ পাঁচজনকে দিত। ছেলেমেয়েরও তাদের মতোই দিত। একজনের জন্যে বাইশটা পঁচিশটা কিনত না!

প্যাকেটের পর প্যাকেট।"[৬]

'অনায়ত্ত ব্যাধি' গল্পে ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রুদ্র মনে করেন, "এ-যুগের প্রধানতম ব্যাধি হচ্ছে 'বিদ্রোহ ব্যাধি'," [৭] যা ক্যান্সারের চেয়েও প্রবলতর। একালের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা কথায় কথায় বিদ্রোহ করে, চেয়ার-টেবিল ভেঙে প্রতিবাদ জানায়, মিছিলে পা মেলায়। এরা অভিভাবকদের মানে না, আস্থা রাখতে পারে না ঈশ্বরে। ডাক্তার রুদ্রের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এই বিদ্রোহাত্মক শিশু-মনস্তত্ত্বের কারণ। তিনি আঙুল তুলেছেন তাদের শৈশবযাপনের দিকে। দায়ী করেছেন অভিভাবকদের, বিশেষত মায়েদের। ছেলে-মেয়েদের 'মানুষের মতো করে মানুষ' [৮] করতে একালের মায়েরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাদের ঘোড়দৌড় করাচ্ছেন। পড়াশোনা-খাওয়া-ঘুমোনো-দৌড়োনো-সাঁতার কাটার ছকে বাঁধা রুটিনে নেই তাদের নিজস্ব কোনো সময়। এক মুহূর্তও তারা নিজেদের ইচ্ছায় মনের আনন্দে কিছু করতে পারে না। সবসময় উদ্যত শাসনের চাবুক। ফলে অবদমিত হয় শিশুমনের ছোট ছোট শখ, আহ্লাদ, আবদার। অসহায় শৈশবে তারা সবকিছুই মুখ বুজে মেনে নেয়। কেবল মনের মধ্যে জমতে থাকে অভিমান-রাগ-বিদ্বেষ, যা পরবর্তীকালে বিদ্রোহের আকারে বেরিয়ে আসে। অতিরিক্ত চাপাচাপিতে নষ্ট হয় শিশুমনের ভারসাম্য। না তারা বড়দের সম্মান করতে শেখে, না তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে ধৈর্য-সংযম-পরমত সহিষ্ণুতা। একটু বড় হতেই তারা আর কাউকেই মানতে চায় না, কেবল নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। সন্তান মানুষ করার প্রবল তাড়নায় অভিভাবকরা ভুলে যান, শিশু কোনো যান্ত্রিক সত্তা নয়, তাদেরও মন আছে, আছে ইচ্ছে-অনিচ্ছে। অতিরিক্ত শাসন-পীড়ন, জোরজবরদস্তির পরিবর্তে প্রতিদিনের নির্ধারিত রুটিনে তাদের পছন্দ-ভালোলাগার কাজের কিছু জায়গা যদি রাখা যায়, তবে মনের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে যাবে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার পথে।

ছয় বছরের ছেলে তোতাকে নিয়ে পুজোর বাজার করতে যায় চৈতালী। বাজার থেকে ফিরে এসে তোতা বাবার কাছে মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগে ফেটে পড়ে। নানা দোকানে ঘুরে মায়ের যথেচ্ছ কোল্ডড্রিঙ্ক ও পান খাওয়া, জামা-কাপড়ের দাম কমানোর জন্য দোকানিদের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ জানানো তোতার আত্মসম্মানে আঘাত করে। সর্বোপরি কম দামি শাড়ি কিনে তার পরিবর্তে সকলের চোখ এড়িয়ে বেশি দামি শাড়ি নিয়ে পালিয়ে আসা সে মেনে নিতে পারে না। প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলে তোতা জানায়, "আমার ভীষণ খারাপ লেগেছে বাপি, আমার খুব কষ্ট হয়েছে।" [৯] নিজে দোকানে গিয়ে শাড়ির দাম দিয়ে আসবে—বাবার কাছ থেকে এই আশ্বাস পেলে তোতার উত্তেজনা প্রশমিত হয়, সে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু তোতার বাবা মৃণাল উপলব্ধি করে, এই ঘটনা তার সন্তানের মনে এক চিরস্থায়ী ক্ষত তৈরি করে দিয়ে গেল। এরপর আর তোতার পক্ষে তার মাকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করা সম্ভব নয়। বাবা-মা শিশুর জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। আদর্শস্থানীয় মা-বাবাকে সামনে রেখে শিশু ভবিষ্যৎজীবনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করে। কিন্তু তারা যখন আদর্শচ্যুত হন, তখন শিশুর চলার পথও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বাবা-মাকে সম্মান করতে না পারলে সে নিজেকেও সম্মান করতে পারবে না। নষ্ট হবে তার মানসিক ভারসাম্য, মানসিক সুস্থতা। শিশু এগিয়ে যাবে ভবিষ্যতের অন্ধকার গহ্বরে। তাই মৃণালের আক্ষেপ, "সে কি আর

কখনও তার মাকে বিশ্বাস করতে পারবে? শ্রদ্ধা করতে পারবে? আর এই না-পারাটায় তার মা'র যা ক্ষতি হবে, তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি হবে তার। মাকে যে শ্রদ্ধা করতে শিখবে না, নিজেকেই কি সে শ্রদ্ধা করতে শিখবে? তোতার জীবনের ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে গেল চৈতালী।"[১০] লক্ষণীয় চৈতালীর মানসিকতা। তার মতে, বাসে-ট্রেনে বিনাটিকিটে চড়া, দোকানির চোখ এড়িয়ে বেশিদামি কাপড় নিয়ে আসা—এগুলি অতি হচ্ছে ব্যাপার। সে এগুলিকে অপরাধ বলে মনে করে না। তার বিশ্বাস, ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পড়ালেই ছেলে-মেয়েরা ভালো সহবত শেখে। আর সম্মান আদায়ের সহজ পথ সন্তানের চাহিদাপূরণ। শুধু চৈতালী নয়, আমরা জানি আজকের বহু অভিভাবকই এই মতে বিশ্বাসী। 'যে যেমন ভাবে যে যেমন দেখে' গল্পে তোতার দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণা দেবী এই মতের অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণ করেছেন। তাই ছেলের সমস্ত আবদার পূরণ করলেও চৈতালীর অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। তোতা তার মাকে সম্মান করতে পারে না। এছাড়া ছোটদের অবোধ মনে করার যে প্রচলিত মানসিকতা, তাও এখানে খণ্ডিত হয়েছে। শিশু মোটেই অবোধ নয়, তারাও সবকিছু লক্ষ করে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে পারে, তাদেরও মান-সম্মান বোধ আছে—তোতার আচরণের মধ্য দিয়ে এই বিষটির প্রতিই লেখিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিবাহবিচ্ছেদ বর্তমান যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। মনোমালিন্য, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানো ইত্যাদি যেকারণেই বিচ্ছেদ ঘটুক, তা সন্তানের মন-মানসিকতায় ফেলে যায় গভীর ছাপ। 'ক্যাকটাস' গল্পে ভারতী-শিশিরের সুখী দাম্পত্যজীবনে হঠাৎই ঘনিয়ে আসে বিচ্ছেদের কালো মেঘ। ভাড়াবাড়ির সমস্যা মেটাতে অধ্যাপিকা ভারতী কলেজের ছাত্রীনিবাসের পরিচালিকার দায়িত্ব নিয়ে নতুন ফ্ল্যাটে চলে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় আট বছরের ছেলে ঘন্টুকে। আর 'চিরন্তন পুরুষ জাতির অর্থহীন অহমিকা'[১১] নিয়ে অফিসের কেরানি শিশির থেকে যায় পুরোনো ভাড়াবাড়িতেই। প্রতি রবিবার অবশ্য তারা দেখা করে, তিনজনে একসঙ্গে সময় কাটায়। তবে ঘন্টুর স্বভাব-প্রকৃতিতে আমূল বদল ঘটে যায়। ঘন্টু "আগের মতো জেদ করে না, লাফা লাফি করে না। ভারি শান্ত হয়ে গেছে ছেলেটা। শান্ত আর গম্ভীর।"[১২] আনন্দের সঙ্গে রবিবারের সূচনা ঘটলেও সমাপ্তি ঘটে বিষাদময়তায়। বাবার দেওয়া নিত্যনতুন উপহারও তার মুখের হাসি অটুট রাখতে পারে না। বাবাকে ছেড়ে চলে আসার সময় "ঘন্টু মুখ ফিরিয়ে থাকে। মুখ নিচু করে থাকে। ঘন্টু চোখটা কিছুতেই মা-বাপকে দেখতে দেয় না।"[১৩]

শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন বাবা-মা উভয়েরই সান্নিধ্য, তাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক, ভালোবাসা, সদ্ভাব। উপহার বা সুযোগ-সুবিধা বাবা-মায়ের বিকল্প হতে পারে না। বাবা-মায়ের মনোমালিন্য-বিচ্ছেদে শিশু সংকট বোধ করে। অভিমানে তাদের দিক থেকে মুখ ফেরায়। অন্য শিশুদের সঙ্গে তুলনায় হীনমন্যতা বোধ করে, যা তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ঘন্টুও প্রবল অভিমানে মা-বাবার কাছে মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করে না, চোখের জল লুকোয়। আর এই অবদমনের কারণেই উচ্ছলতা হারিয়ে সে হয়ে ওঠে শান্ত-গম্ভীর।

'ভবিষ্যৎ বাণী' গল্পে আশাপূর্ণা দেবী কৈশোরের একটি বিশেষ প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন। এই বয়সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করা, মনে প্রেমের উন্মেষ ঘটা, পরিণামে প্রেমের কবিতা লেখা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অভিভাবকদের কাছে তা সবসময় স্বাভাবিক ঠেকে না। গল্পে বারো বছরের মেয়েটি কৈশোরের আবেগে প্রেমের কবিতা লিখলে অভিভাবকদের মাথায় যেন বাজ পড়ে। সেকেলে মানসিকতার অভিভাবকদের কাছে তা ঘোরতর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে মেয়েটিকে যে হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তাতে তার উপলব্ধি, "সমস্তক্ষণ মনে হ'তে লাগলো 'পৃথিবী দ্বিধা হও'! ঘোরতর একটা কুকাজ যে করে ফেলেছি তাতে আর সন্দেহ রইলো না! অথচ কি যে করেছি তাও ঠিক ধরতে পারছি না।"[১৪] বড়দের জটিলতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না ছোটরা। তাই নিজের অপরাধ মেয়েটির বোধগম্য হয় না। বরং সে যে আরো একটি কবিতা ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছে, তা অকপটে স্বীকার করে। কিন্তু অভিভাবকদের ব্যঙ্গ-তিরস্কারে মনে মনে সংকুচিত হয়ে পড়ে সে। গল্পের ঘটনাধারা অনুসরণ করে জানা যায়, পরবর্তীকালে মেয়েটি সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তবে

শিশু-মনস্তত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ অভিভাবকদের বিরোধিতায় তার চলার পথ যে যথেষ্ট কঠিন হয়ে ওঠে, তা সহজেই বোঝা যায়।

বাবার মৃত্যুর পর মা মন্দিরার শাসন-যন্ত্রেই মিষ্টির বেড়ে ওঠা। বৈধব্যের যন্ত্রণায় মন্দিরার হাসিতেও বিষাদের ছায়া। কিন্তু বয়ঃসন্ধির চাপল্যে মিষ্টি উচ্ছল। বয়ঃসন্ধি (Puberty) বাল্য-কৈশোরের সংযোগস্থল। এই পর্বে দেহ-মনে যে বিপুল পরিবর্তন আসে, তা কিশোর-কিশোরীদের আত্মসচেতন করে তোলে।

বিশেষ করে মেয়েরা হয়ে ওঠে সৌন্দর্য-সচেতন। বারো বছরের মিষ্টি সুদর্শন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণে পুলকিত হয়। মোটা হওয়ায় স্কুলের দিদিমণিকে ব্যঙ্গ করে। একদিন মিষ্টিদের বাড়িতে আসে মন্দিরার বাল্যবন্ধু সুকান্ত। অল্পক্ষণেই সুকান্তমামার সঙ্গে মিষ্টির খুব ভাব হয়ে যায়। সুকান্তমামার কাছেই তার সব আবদার। স্থান-কাল ভুলে সুকান্ত মিষ্টিদের বাড়িতে প্রতিদিন আসতে শুরু করে। মন্দিরাও সুকান্তর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু মিষ্টি দু'মিনিটও তাদের গল্প করতে দেয় না।

নানা অজুহাতে সুকান্তমামাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজ আবদার মেটাতে থাকে। শেষে শ্লীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগ এনে সুকান্তমামার বাড়িতে আসা বন্ধ করে। আবার পরমুহূর্তেই মায়ের কাছে অন্যায় স্বীকার করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মিষ্টির এই অদ্ভুত আচরণের কারণ খুঁজতে আমাদের ডুব দিতে হয় কৈশোর-মনস্তত্ত্বের গভীরে। বয়ঃসন্ধি কৈশোরের প্রথম পদক্ষেপ। কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রবল হয় আত্মপ্রকাশের চাহিদা। তারা বড়দের কাছে গুরুত্ব পেতে চায়। তাই দেখা যায়, মিষ্টি নানাভাবে সুকান্তমামার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। আর একটি বিষয়ও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। নিরাপত্তার চাহিদাও কৈশোরে প্রাধান্য পায়। মিষ্টির বাবা নেই। মা-ই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেক্ষেত্রে মা ও সুকান্তমামার ঘনিষ্ঠাতায় সে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। তাই সুকান্তমামাকে মায়ের কাছ থেকে দূরে সরাতে সে সবসময় তাকে নানা অজুহাতে নিজের কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর পাকা বন্দোবস্ত করে। কৈশোরে বিবেকবোধের (Super ego) বিকাশ ঘটে। এই বিবেকের দংশনেই অনুতপ্ত মিষ্টি মায়ের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে। 'বয়ঃসন্ধি' গল্পে মিষ্টি চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা কৈশোরের মানসিক সংকটকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মূল্যায়ন

অভিভাবকদের সঙ্গে প্রতিমুহূর্তের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে শিশু এগিয়ে চলে ভবিষ্যৎ পরিণমনের দিকে। বাবা-মা-ই শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। তাদের খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই সে নিজেকে গড়ে তোলে। তৈরি হয় তার মন-মানসিকতা। মা-বাবার সচেতন ব্যবহার, স্নেহময় সান্নিধ্য, আন্তরিক সহযোগিতা শিশুর সুস্থ মানসবিকাশের সহায়ক; অন্যথায় শিশুমনে পড়ে নানা নেতিবাচক প্রভাব। অভিভাবকদের ছলনা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্ববিরোধিতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, বিরুদ্ধ সমালোচনা, অতিরিক্ত শাসন-তিরস্কারে সরল-সংবেদনশীল শিশুমন কিভাবে অবাঞ্ছিত জটিলতায় পথ হারায়; উক্ত গল্পগুলিতে আশাপূর্ণা দেবী নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র

১। আশাপূর্ণা দেবী 'ভিতর পৃষ্ঠা', *গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড,* কলকাতা: সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯, পৃ: ৫৮।

২। আশাপূর্ণা দেবী, 'আতঙ্কিত', *গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড,* কলকাতা: সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯, পৃ: ২৬২।

৩। আশাপূর্ণা দেবী, 'আতঙ্কিত', *গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড,* কলকাতা: সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯, পৃ: ২৫৮।

৪। প্রাগুক্ত।

৫। আশাপূর্ণা দেবী, 'এযুগের শিক্ষা দীক্ষা', *গল্পসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা: সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯, পৃ: ৩৬৫।

৬। প্রাগুক্ত।

৭। আশাপূর্ণা দেবী, 'অনায়ত্ত ব্যাধি', *গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড,* কলকাতা: সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯, পৃ: ২৭০।

৮। আশাপূর্ণা দেবী, 'অনায়ত্ত ব্যাধি', *গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড,*কলকাতা: সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯, পৃ: ২৭৩।

৯। আশাপূর্ণা দেবী, 'যে যেমন ভাবে যে যেমন দেখে', *গল্পসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা: সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯, পৃ: ২৯০।

১০। আশাপূর্ণা দেবী, 'যে যেমন ভাবে যে যেমন দেখে', *গল্পসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড,* কলকাতা: সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯, পৃ: ২৯১-২৯২।

১১। আশাপূর্ণা দেবী, 'ক্যাকটাস', নূপুর গুপ্ত (সম্পাদনা),*পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প,* কলকাতা: শ্রী নির্মলকুমার সাহা, সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ: ১৭২।

১২। আশাপূর্ণা দেবী, 'ক্যাকটাস', *পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প,* নূপুর গুপ্ত(সম্পাদনা),*পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প,* কলকাতা: শ্রী নির্মলকুমার সাহা, সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ: ১৮১।

১৩। প্রাগুক্ত।

১৪। আশাপূর্ণা দেবী, 'ভবিষ্যৎ বাণী', *গল্পসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড,* কলকাতা:এস. এন. রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৫, পৃ: ২৬০।